ভারতীয় জনতা পার্টি
বিধাননগর মণ্ডল স্টাডি সার্কেল

গুজরাট দাঙ্গা ও নরেন্দ্র মোদী:
অপপ্রচারের জবাবে

মনোজ দাশ

।। গুজরাট দাঙ্গা ও নরেন্দ্র মোদী : অপপ্রচারের জবাবে ।।

মনোজ দাশ

প্রাপ্তিস্থান:
ভারতীয় জনতা পার্টি, বিধাননগর মণ্ডল,
এ.জে. ১৪৫, সেক্টর ২, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

ভারতীয় জনতা পার্টির বিধাননগর মণ্ডল একটি স্টাডি সার্কেল তৈরি করেছে, যার মধ্য দিয়ে বিজেপির মতাদর্শ, লক্ষ ও লক্ষপূরণের জন্য কী করা হচ্ছে এবং কী করা উচিত সেই সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে ওয়াকিবহাল করাই উদ্দেশ্য। পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিস্টরা এবং তাদের দোসর অন্য দলগুলি ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মুসলিম তোষণের মাধ্যমে যেভাবে এই রাজ্যটির সর্বনাশ করছে, যেভাবে বাঙালি হিন্দুদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করছে, সেই বিপদ সম্পর্কে সবাই সচেতন হন — এটাই আমরা চাই।

।। গুজরাট দাঙ্গা ও নরেন্দ্র মোদী : অপপ্রচারের জবাবে ।।

ভূমিকা

গোধরা কাণ্ড এবং তৎপরবর্তী গুজরাট দাঙ্গার এগার বছর পর নরেন্দ্র মোদীর প্রবল সমালোচক সেকুলার রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার সংগঠন, এন.জি.ও., মিডিয়া পণ্ডিত ইত্যাদিদের লম্বা লাইনে অতি সম্প্রতি এসে দাঁড়িয়েছেন বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন.ডি.এ. জোটের সবচেয়ে পুরনো শরিক জনতা দল (ইউনাইটেড) ও তার নেতা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। সবার পরে এসেছেন বটে, কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ও আর্থিক কেলেঙ্কারিতে আপাদমস্তক নিমজ্জিত বোফর্সখ্যাত রাজীব-ঘরণী শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধীর বশংবদ প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত 'মৌন'মোহন সিং এবং তস্য পারিষদবর্গ বাবু নীতীশ কুমারের অকস্মাৎ ভোলবদলের মধ্যে খুঁজে পেতে চাইছেন আগামী লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করার জন্য কিছুটা অক্সিজেন। ফলত, একদা নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ শ্রীযুক্ত নীতীশের দাঙ্গার অব্যবহিত পরে দেওয়া সার্টিফিকেটগুলি আপাতত বিস্মৃতির ইতিহাসের নীচে চাপা দিয়ে কংগ্রেস দল এবং অন্য সেকুলার মহাশয়েরা তুমুল বিক্রমে নেমে পড়েছেন মোদীজীর মুণ্ডপাত করার জন্য। নীতীশের ভোলবদলের পিছনের আসল কারণটি যে দেবগৌড়া, চন্দ্রশেখর, গুজরালদের মত তালে গোলে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসা - সেটা আনপড় জনতা বুঝলেও সেকুলার বাবুরা বুঝতে চাইছেন না। কিংবা বুঝলেও প্রকাশ করতে চাইছেন না। মানুষের স্মৃতি কখনও সবল নয়। ভুলে যাওয়াটাই আমাদের ধর্ম, ভুলতে আমরা ভালবাসি। আর এই ভুলিয়ে দেওয়ার খেলার পিছনে যদি থাকে গোবেবল্‌স্‌কে হার মানায় এমন মিথ্যা প্রচারের বন্যা — তবে তো কথাই নেই। তখন সত্যের ঠাঁই হয় গোরস্থানে। কিন্তু ইতিহাসের স্বার্থে, ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে সত্যকে কবর থেকে বেরও করে আনতে হয়। শিক্ষা নিতে হয়। যাতে আগামী দিনের সঠিক পথনির্দেশ পাওয়া যায়।

সাবরমতী এক্সপ্রেসে অগ্নিসংযোগ

গুজরাটে সেদিন কী ঘটেছিল? ২৭-০২-২০০২ তারিখে সাবরমতী এক্সপ্রেসে করে অযোধ্যা থেকে ফিরছিল হিন্দু তীর্থযাত্রীরা। গুজরাটের গোধরা রেল স্টেশনের কাছে প্রায় ২০০০ জনের এক মুসলিম জনতা সেই ট্রেন আক্রমণ করে, আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন লাগার

পর কোনও যাত্রী যাতে পালিয়ে না বাঁচতে পারে তার জন্য ট্রেনের দুপাশে পেট্রোল বোমা, অ্যাসিড বোমা, তরোয়াল, আরও নানান অস্ত্র নিয়ে মোতায়েন থাকে সেই জনতা। ফলত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান ৫৮ জন তীর্থযাত্রী। যার মধ্যে ২৫জন মহিলা ও ১৫ জন শিশুও ছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধে। দাঙ্গা চলেছিল তিনদিন। যদিও, বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ চলেছিল প্রায় পাঁচ মাস ধরে। সংঘর্ষে মারা যান ৭৯০ জন মুসলমান এবং ৫৮ জন হিন্দু (এই সংখ্যার মধ্যে গোধরায় মৃত ৫৮ জন নেই)। এছাড়া মারা যান ২০০ জন পুলিশ। পরিস্থিতি যখন শান্ত হয়ে এসেছে, তখন নতুন করে দাঙ্গার আগুন লাগাবার জন্য ২৪-০৯-২০০২ তারিখে ইসলামী সন্ত্রাসবাদীরা গান্ধীনগরের স্বামীনারায়ণ মন্দির অক্ষরধামে আক্রমণ চালিয়ে ২৯ জন হিন্দুকে হত্যা করে। সৌভাগ্য, এই ঘটনার পরে আর নতুন করে দাঙ্গা ছড়ায়নি। নরেন্দ্র মোদীর সরকার সামলে নিয়েছিল পরিস্থিতি।

কেন ট্রেনে আক্রমণ

বছরের পর বছর ধরে হাজার হাজার ট্রেন যাওয়া-আসা করছে বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার মধ্যে দিয়ে। কোথাও এমন আক্রমণ হয়নি। কিন্তু এখানে কেন হল? একটি সূত্রে প্রকাশ — হিন্দু তীর্থযাত্রীরা গোধরা স্টেশনে মুসলিম ভেণ্ডারদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল, তার শাস্তি দিতে দল জুটিয়ে এই আক্রমণ। প্রশ্ন উঠতেই পারে — এমন কী দুর্ব্যবহার, যে লোক জুটিয়ে এমন ভাবে পুড়িয়ে মারা হল এতগুলো মানুষকে? দেশে আর কোথাও কি কোনওদিন ভেণ্ডার-যাত্রী গোলমাল হয়নি? দ্বিতীয় একটি কারণ হিসেবে জানা যায় যে, সম্ভবত রান্নার স্টোভ ফেটে আগুন লাগে কামরার ভিতরে, ছড়িয়ে পড়ে সেই আগুন। এখানে প্রশ্ন — কেরোসিন তেলে জ্বলে যে স্টোভ, তার আগুন এত তাড়াতাড়ি ছড়াল কীভাবে? পেট্রল ছাড়া আগুন কি এভাবে ছড়াতে পারে? অবশ্যই না। তৃতীয় একটি কারণের কথাও জানা যায়। তা হল, অযোধ্যায় ছিল বাবরি মসজিদ, যা ১৯৯২ সালে করসেবকরা ভেঙে দিয়েছিল। অযোধ্যা প্রত্যাগত তীর্থযাত্রীদের প্রতি আক্রোশের মূল কারণ হল সেটাই। কিন্তু আক্রোশ যতই থাক, এত দ্রুত সেই আক্রোশকে কাজে পরিণত করা হল কীভাবে? এখানেই আসে পূর্ব পরিকল্পনার কথা। এই পূর্ব পরিকল্পনা তত্ত্ব খারিজ করতে এবং মুসলিমদের ঘাড় থেকে সন্দেহের বোঝাটা নামাতে রেলমন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লালু প্রসাদ যাদব সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তণ বিচারপতি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জিকে দিয়ে একটি তদন্তের ব্যবস্থা করলেন। জাস্টিস ব্যানার্জি তাঁর রিপোর্টে বললেন, বাইরে থেকে আগুন লাগানো হয়নি, আগুন সম্ভবত লেগেছিল ট্রেনের ভিতরে। স্টোভ ফেটে। এছাড়াও তিনি কড়া

ভাষায় সমালোচনা করলেন স্থানীয় পুলিশের তদন্তের। ২০০৬ সালে গুজরাট হাইকোর্ট রায় দেয় যে ব্যানার্জি কমিটি অবৈধ, অসাংবিধানিক এবং ভারত সরকারের এক্তিয়ার বহির্ভূত। ফলত বাতিল হয় ব্যানার্জি কমিটির রিপোর্ট। এরপর গুজরাট সরকার নিযুক্ত নানাবতী-শাহ কমিশন রিপোর্ট দেয় যে, ট্রেনে আগুন লাগানো হয়েছিল বাইরে থেকে এবং তীর্থযাত্রীদের উপর আক্রমণ হয়েছে একেবারে পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র মোতাবেক।

গোধরা পরবর্তী দাঙ্গা

গোধরার ভয়াবহ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যত গুজরাটের শহরাঞ্চলে যথা আমেদাবাদ, গান্ধীনগর ইত্যাদি জায়গায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। আগেই বলেছি, মাত্র তিনদিনের মধ্যে ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু কংগ্রেস ও তার মিত্র তথাকথিত সেকুলারদের অভিযোগ, দাঙ্গার সময় হিন্দু দাঙ্গাকারীদের মদত দিয়েছিল পুলিশ ও প্রশাসন। প্রশাসন মানে নরেন্দ্র মোদী। অতএব তাঁকে অভিযুক্ত করা হল। আর এই কারণেই সেকুলারদের বক্তব্য — এই দাঙ্গা সরকারি মদতপুষ্ট গণহত্যা বা Genocide। যার আভিধানিক অর্থ হল, পরিকল্পিতভাবে কোনও জনগোষ্ঠী বা জাতিকে ধ্বংস করা। জেনোসাইডে মৃত্যু ঘটে সম্পূর্ণ একতরফাভাবে, বিনা প্রতিরোধে। যেমন ঘটেছিল হিটলারের হাতে ইহুদিদের। যেমন ঘটেছিল নোয়াখালিতে মুসলমানদের হাতে হিন্দুদের। গুজরাট দাঙ্গা কি এই সংজ্ঞাতে পড়ে? এখানে ২৫৪ জন হিন্দু মারা গেছে, ২০০ জন পুলিশ মারা গেছে, বাড়িঘর জ্বালানো ও অন্যান্য অত্যাচারও একতরফা নয়। বরং বলা যায় যে, ২০০২-এর গুজরাট দাঙ্গা নয়, ১৯৮৪-র শিখ হত্যা ছিল সেই অর্থে Genocide; কিংবা ১৯৪৬-এর অক্টোবর মাসের নোয়াখালি দাঙ্গা। যেখানে ৫০০০০ হিন্দুকে হত্যা করা হয় এবং গোটা নোয়াখালিকে প্রায় হিন্দুশূন্য করে ফেলা হয়। Genocide দিয়ে শুরু হয়েছিল ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্টের দাঙ্গাও। তবু গুজরাটের ক্ষেত্রে ব্যবহার হল এই অভিধা এবং এদেশের আগমার্কা আমেরিকা-বিদ্বেষী (কম্যুনিস্ট) এম.পি.-রা অন্যান্য সেকুলার এম.পি.-দের সঙ্গে মিলে ৬৫ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত এক কাতর আবেদন পাঠাল মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে — 'দয়া করে মোদী নামের এই ঘাতকটিকে যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখতে দেবেন না।' সম্প্রতি এই চিঠির বিষয় ফাঁস হতে বিপ্লবীপ্রবর সীতারাম ইয়েচুরি তাঁর সই জাল হয়েছে বলে বিপ্লবীয়ানা দেখাতে গিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর সিপিআই সহযোগী এম পি আজিজ পাশা জল ঢেলে দিয়েছেন এই বলে যে, সীতারাম সই করেছিলেন তাঁরই সামনে। আর স্বাক্ষর সংগ্রহের উদ্যোগ যাঁর সেই নির্দল এম পি মহম্মদ আদিব বলেছেন — জাল মনে হলে কোর্টে যান ইয়েচুরি। সে সাহস তাঁর হয়নি। কারণ, ইতিমধ্যে

জ্বলন্ত সাবরমতী এক্সপ্রেস, গোধরা, ২৭.২.২০০২
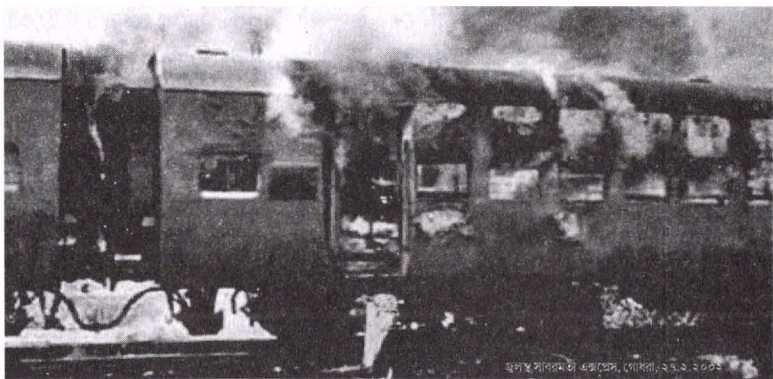
আমেরিকার ফরেন্সিক দফতর জানিয়েছে, কোনও সই-ই নকল নয়, সব আসল। থাক সে কথা। আমরা আসি দাঙ্গা এবং প্রশাসনের যোগসাজসের অভিযোগের বিষয়ে। কেননা, মনে আর মুখে কখনও এক হয় না কম্যুনিস্টরা। বাঙালি ছাড়া কে আর এত ভাল করে জানে একথা?

পুলিশ ও প্রশাসনের ভুমিকা

যদি হিন্দু দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে যোগসাজস থাকে, তবে এত হিন্দু মারা গেল কেন? এত পুলিশ নিহত হল কেন? বরদারাজন কমিটি জানিয়েছে, হিন্দুদের বেশির ভাগ নিহত হয়েছে পুলিশের গুলিতে। এটা কি পুলিশের মদত দেওয়া প্রমাণ করে? তিন দিনের মধ্যে দাঙ্গা থেকে যাওয়া কি প্রমাণ করে যে প্রশাসন নিষ্ক্রিয় ছিল? গুজরাত সরকার তো ২৮-০২-২০০২ তারিখেই সৈন্য নামিয়েছিল দাঙ্গা দমনে। সেটা তাহলে কী? এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার — দাঙ্গা থামাতে উদগ্রীব মোদীজী ব্যাপক হারে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে দাঙ্গাকারীদের গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মোট ২৭,৭৮০ জনকে আটক করা হয়। তার মধ্যে ২১, ৭০০ জন হিন্দু, ৬০৮০ জন মুসলিম। সংখ্যাটি কী প্রশাসনের পক্ষপাত প্রমাণ করে? প্রশাসনের পক্ষপাতে দাঙ্গা কী ভয়ংকর হতে পারে, তার অন্যতম বড় প্রমাণ ১৬ আগষ্ট ১৯৪৬-এর ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র দাঙ্গা। যার আর এক নাম গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। দেশভাগের দাবীতে মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ আলী জিন্নাহ্ ডাক দিয়েছিলেন এই ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র। কোনও র‍াখঢাক না করেই বলেছিলেন অস্ত্র হাতে নিতে। সোজাসুজি বলেছিলেন — আমি এথিক্'স্ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি না। আমার হাতে একটা পিস্তল আছে আর আমি সেটা ব্যবহার করব। ব্রিটেনের নিউজ ক্রণিকল পত্রিকা তখন বলেছিল — জিন্নাহ্ ধর্মযুদ্ধ চাইছেন। এবং ধর্মযুদ্ধ হয়েওছিল। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সুরাবর্দী।

মাত্র তিনদিনের দাঙ্গায় সরকারী হিসেবেই মৃতের সংখ্যা ছিল ৪০০০। বেসরকারী হিসেবে সংখ্যাটা ২০,০০০-এর বেশি। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার ছিল নিহতদের শতকরা প্রায় আশি ভাগ হিন্দু। যদিও তখনকার কলকাতার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৪ ভাগ ছিল হিন্দু এবং ৩৩ শতাংশ ছিল মুসলমান। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম লীগ মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য সমর্থনে ও ষড়যন্ত্রে হিন্দুরা হাজারে হাজারে নিহত হয়েছিল। কেবলমাত্র মেটিয়াবুরুজের লিচুবাগান এলাকার কেশোরাম রেয়ন মিলেই কয়েক হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে ওড়িয়াদের একটা বিরাট সংখ্যা ছিল। এই প্রসঙ্গে আর একটা ব্যাপারও উল্লেখ্য। সেটা হল দাঙ্গার সময় নির্বাচন। ১৬ আগষ্ট ১৯৪৬ ছিল রমজান মাস। এই বিশেষ মাসটি মুসলমানদের ইতিহাসে বড় গুরুত্বপূর্ণ। রমজান মাসে কোরাণের বাণীর প্রকাশ ঘটে। মহম্মদ নিজে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বদরের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন ও জেতেন রমজান মাসে। মক্কার যুদ্ধ ও সেই যুদ্ধে জয়লাভও করেন মহম্মদ এই মাসটিতে। এহেন রমজান মাসে পঞ্চায়েত ভোট হলে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের বড় ক্ষতি হবে বলে কয়েকদিন আগে যারা সুপ্রিম কোর্টে অনুনয় বিনয় করেছিলেন, তাঁদের কথা শুনলে হাসি পায়। ইতিহাসের বিন্দুবিসর্গও তাঁরা পড়েননি কিংবা পড়লেও মনে রাখেননি। রমজান মাসকে মুসলিমরা যুদ্ধের জন্য পবিত্র মাস মনে করে। প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্ট দাঙ্গার আর এক উদাহরণ নোয়াখালি। যেখানে হিন্দু জাতিটাকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল মুসলিমরা। সাম্প্রতিক কালের কথায় আসি। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসি জমানায় আরো অনেক বড় মাপের দাঙ্গা হয়েছিল গুজরাটে। সেবার আড়াই হাজারের বেশি মানুষ মারা যায়, ৬৫ দিন কার্ফু জারী থাকে। ছ'মাসের বেশি সময় ধরে চলে দাঙ্গা। ১৯৮০, ১৯৮২ এবং ১৯৯০ থেকে ১৯৯২ বারবার দাঙ্গা বেধেছে গুজরাটে। এর মূলে আছে গুজরাটের ওপর সেই মধ্যযুগ থেকে নেমে আসা বিদেশী মুসলিম অত্যাচারের ভয়াবহ ইতিহাস। যার শুরু ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ-বিন-কাশিমের আক্রমণের মাধ্যমে। তারপর থেকে মুঘল শাসনে, ইংরেজ শাসনে এবং স্বাধীনোত্তর পর্বে বারবার বেধেছে দাঙ্গা। দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সম্পর্ক কোনও কালেই মধুর ছিল না। বরং বলা যায় মোদীর সরকার এই সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে অনেকটাই সফল। ২০০২-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত গুজরাটের কোথাও হিন্দু-মুসলমানের একটি সংঘর্ষও হয়নি। নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নের কর্মকাণ্ড গুজরাটের মানুষকে সংকীর্ণ ধর্মীয় রাজনীতির বিষাক্ত মানসিকতা কাটিয়ে সুস্থ জীবনের পথে এগিয়ে দিয়েছে বলেই গুজরাট এখন দাঙ্গামুক্ত।

কিছু মিথ্যাচারের নমুনা

মানবাধিকার নেত্রী তিস্তা শীতলবাদ ও বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখিকা অরুন্ধতী রায় বেশ কিছু মুসলিম রমণীর নাম উল্লেখ করে অভিযোগ করেছিলেন যে এরা গণধর্ষণের শিকার। পরে তদন্তে জানা যায় এই মহিলাদের অনেকের বাস্তবে অস্তিত্বই নেই। সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত ও প্রাক্তন সিবিআই ডিরেক্টর রাঘবনের নেতৃত্বে গঠিত স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন (SIT) তদন্ত শেষে ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে আদালতে পেশ করা রিপোর্টে বলে যে অত্যাচারের খবরকে বিপুল ভাবে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে মশলাদার হিসেবে পরিবেশন করার জন্যে। একটি ঘটনায় কওসার বানু নামে এক মহিলার ধর্ষণ ও ধর্ষণের পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে পেট থেকে ভ্রূণ বের করে আনার রোমহর্ষক বিবরণ দেওয়া হয়। দেখা যায়, ঘটনাটি ডাহা মিথ্যা। ২২ জন মহিলার এফিডেবিট জমা করেন শীতলবাদ খুন ও ধর্ষণের ভুক্তভোগী কিংবা প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে। এরা সবাই তদন্তের মুখে জানায় তাঁরা কিছুই দ্যাখেনি। তাঁদের এফিডেবিট তৈরি করেছেন তিস্তা এবং সবাইকে মিথ্যে সাক্ষ্য দিতেও শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। রাঘবনের নেতৃত্বে গঠিত SIT সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতি অরিজিৎ পাসায়েত, পি সথাশিবম (বর্তমান প্রধান বিচারপতি) এবং আফতাব আলমের ডিভিশন বেঞ্চকে এই সমস্ত রিপোর্ট দিয়েছে। কংগ্রেস এমপি এহ্সান জাফরি তাঁর বাড়ির ছাদ থেকে গুলি ছুঁড়েছিলেন। এর পর তিনি আক্রান্ত হন ও নিহত হন। তাঁর স্ত্রী জাকিয়া জাফরি মামলায় টেনে আনেন মোদীজীকে। কেননা, তাঁর হুকুমে নাকি পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল এবং তাঁর স্বামীকে বাঁচাতে আসেনি। SIT-এর তদন্তের ভিত্তিতে আদালত মোদীর বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ খারিজ করে দেয়। বিখ্যাত বেস্ট বেকারি কেস-এর প্রধান সাক্ষী ছিল জাহিরা শেখ। সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সে বারে বারে বক্তব্য পাল্টেছে। তার বিরুদ্ধে ওঠা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগের তদন্ত করতে সুপ্রিম কোর্ট কমিটি পর্যন্ত গঠন করে। তখন জাহিরার হয়ে শীতলবাদ আবেদন জানান যে গুজরাটে তার মক্কেলের প্রাণসংশয়, মামলা মহারাষ্ট্রে পাঠানো হোক। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে। যদিও মহারাষ্ট্রে গিয়ে জাহিরা আদালতকে বলে যে তিস্তা দিদিমণি ও অন্যরা তাঁকে মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। এরকম বহু ঘটনা আছে। বাস্তবে হয়েছে এক, আদালতে অভিযোগ আনা হয়েছে আর এক। এই মিথ্যাচারের নাম সেকুলারিজম্, যদিও, যখন লাখে লাখে কাশ্মীরী হিন্দুরা মুসলমানদের অত্যাচারে ভিটেমাটি ছেড়ে মান-ইজ্জত খুইয়ে দিল্লি এবং দেশের অন্যত্র উদ্বাস্তু শিবিরে মনুষ্যেতর প্রাণীর জীবন নির্বাহ করে, তখন এই মানবদরদী মহাপুরুষদের ক্ষীণতম কণ্ঠও শোনা যায় না। তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা দেখা যায় না। সেকুলারদের এই মহান রাজনীতির একটা ছোট্ট পরিচয় দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। এই কাহিনির

কেন্দ্রে আছে কুতবউদ্দিন আনসারি নামে এক গুজরাটি মুসলমান। গুজরাটের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত এই মানুষটিকে নিয়ে পশ্চিমবাংলার তৎকালীন খানদানী সেকুলার মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল সিপিএম-এর নাট্যচর্চায় না ছিল ক্লান্তি, গলার জোরে না ছিল ঘাটতি। আনসারিকে শুধু নেমন্তন্ন করেই ক্ষান্ত থাকেননি তাঁরা। সিপিএম-এর ছাত্র-যুব সংগঠন রীতিমত লোকলস্কর নিয়ে মিছিল করে স্লোগান ফুঁকে তাঁকে হাওড়া স্টেশন থেকে কলকাতায় আনল। খুব একচোট শ্রাদ্ধ হল নরেন্দ্র মোদীর আর গুজরাটের হিন্দুদের। আনসারির কান্নায় ভেঙে পড়া মুখের ছবি উঠতে থাকল খচাং খচ্, সেই ছবি ছড়াল বিশ্বময়। সেখানেই শেষ নয়। পরের অংশে শুরু হল ভাইফোঁটা দেওয়ার ধুম। কিন্তু দুঃখের কথা, বেশিদিন চলল না এই নাটক। আনসারি বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, তাকে নিয়ে নাট্যচর্চার পশ্চাতের ধান্দাবাজিটি। ওদিকে খবর আসছিল গুজরাট থেকে — কোনও সমস্যা নেই। প্রশাসনকে শক্ত হাতে ধরেছেন মোদীজী। কলকাতার যাত্রাদলে কেন আছো ? অতএব দুদিনের ছুটি নিয়ে সেই যে পালালেন, আর এলেন না। এত আয়োজনে তৈরি করা সম্প্রীতির নাটক মুখ থুবড়ে পড়ল।

হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির ভূমিকা

গুজরাট সমেত ভারতের সমস্ত দাঙ্গার পিছনে হাত আছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির — সেকুলারদের বড় প্রিয় অভিযোগ এটি। যদিও, যে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে গুজরাটে হিন্দুরা জড়িয়ে পড়েছে দাঙ্গায়, তাতে পরিষ্কার যে, এই সংগঠনগুলির এব্যাপারে কোনও পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। বিভিন্ন তদন্ত সংস্থার দেওয়া রিপোর্টেও প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাপারটা। তথাপি যত দোষ, নন্দ ঘোষ। প্রশ্ন করা যায় — মুসলিমদের সঙ্গে বৌদ্ধদের সংঘর্ষ চলছে চীনে, মায়ানমারে, মুসলিমদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের দাঙ্গা চলছে নাইজিরিয়া, আলজিরিয়া, ফিলিপিনস্, মরক্কো, চেচনিয়াতে। মুসলমানদের মধ্যে তাদেরই এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের (শিয়া-সুন্নী) ধর্মীয় দাঙ্গা চলছে পাকিস্তানে, ইরাকে, ইরানে — এমনকি ভারতেও। চাকুরির প্রয়োজনে লখনউতে থেকেছিলাম বেশ কিছুদিন। সেখানে থাকাকালীন শুনেছিলাম, লখনউতে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয় না। দাঙ্গা হয়নি কখনও। দাঙ্গা হয় মুসলমানদের দুই গোষ্ঠীতে — শিয়া আর সুন্নীতে। এই ২০১৩ সালের জুলাই মাসেও লখনউতে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা হয়েছে। এইসব দাঙ্গার পিছনে কাদের উস্কানি আছে? বিগত ১২৫ বছরে ১৮৮০টি নানান মাপের দাঙ্গা হয়েছে ভারতে। কারা দিয়েছিল উসকানি? আর এস এসের জন্ম ১৯২৫ সালে, জনসঙ্ঘের জন্ম ১৯৫১ সালে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জন্ম ১৯৬৪ সালে আর বিজেপির জন্ম তো এই সেদিন - ১৯৮০ সালে। তাহলে গত তেরশ' বছর ধরে দাঙ্গার যে ইতিহাস আছে এদেশে, তার জন্য দায়ী কে বা কারা?

১৯৮৪ ও ২০০২: তুলনা-প্রতিতুলনা

১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর দিল্লিতে এবং বিক্ষিপ্তভাবে দেশের আরও কিছু জায়গায় (এমন কি আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ কলকাতাতেও) শিখদের হত্যা করা হয় আর ২০০২ সালে গোধরায় ট্রেনে ৫৮ জন হিন্দুর হত্যার প্রতিক্রিয়ায় গুজরাটে দাঙ্গা বাধে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করেছিলেন তাঁর দুজন শিখ নিরাপত্তাকর্মী আর ২০০০ মুসলিমের এক জনতা হত্যা করেছিল ৫৮ জন সাধারণ তীর্থযাত্রীকে। ইন্দিরা হত্যা একটি ব্যক্তিবিশেষের হত্যা এবং হত্যাকারীরা দলবদ্ধ হয়ে অংশগ্রহণ করেনি এই হত্যাকাণ্ডে, এটা ছিল তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। পক্ষান্তরে, গোধরার হত্যাকাণ্ড এক সম্প্রদায়ের ওপর আর এক সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত আক্রমণ। ইন্দিরা হত্যার মত ঘটনা পৃথিবীর অন্য দেশেও ঘটেছে যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন কেনেডির হত্যা, পাশের দেশে বেনজির ভুট্টো হত্যা। কিন্তু আর কোথাও রাষ্ট্রনায়কের মৃত্যুতে শোকোন্মত্ত হয়ে হত্যাকারীর ভাই-বেরাদরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কচুকাটা করার কোনও উদাহরণ দেখা যায় নি। ১৯৮৪ সালের শিখ হত্যা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, কোনও গণ-অভ্যুত্থানও (mass upsurge) ছিল না এর পেছনে। প্রিয় নেত্রীর মৃত্যুর বদলা নিতে কংগ্রেসী বীরপুঙ্গবরা অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এসেছিল যেখানে সুযোগ পেয়েছে, সেখানে। সাধারণ মানুষের সায় ছিল না এই নরমেধ যজ্ঞে। অপর দিকে গুজরাটের হিন্দুরা দাঙ্গায় নেমেছিল spontaneous mass upsurge-এর মাধ্যমে। তবু আমাদের মহাজ্ঞানী সাংবাদিক প্রবরেরা, রাজনীতিক বিশ্লেষকরা ও সেকুলার চিন্তাবিদরা শিখ হত্যার কুখ্যাত আসামী সজ্জন কুমার আর জগদীশ টাইটলারের পদত্যাগের প্রসঙ্গ তুলে দাবী করেছিল মোদীকেও পদ ছাড়তে হবে এবং বলেছিল দুটো ঘটনাই এক মাপের।

১৯৮৪-র দাঙ্গায় ৩,০০০ শিখ নিহত হয়েছিলেন। গ্রেফতার হয়েছিল ৩,৮৭৪ জন দুষ্কৃতী। হত্যাকাণ্ড হয়েছিল একতরফা। কোনওখানেই শিখরা অস্ত্র হাতে নেন নি, পাল্টা দাঙ্গাও করেননি। (প্রসঙ্গত, এটা বললে অন্যায় হবে না যে, ইন্দিরার হত্যাকারী যদি মুসলমান হত, তবে তলোয়ার নিয়ে রাস্তায় বেরোবার আগে হাজারবার ভাবতে হত কংগ্রেসিদের। প্রশাসনও চুপ করে বসে থাকতে পারত না। ফারাকটা গড়ে দিত ভোটের অঙ্ক। শিখ ভোটাররা সংখ্যার দিক দিয়ে নগণ্য বলেই কংগ্রেসের মস্তানদের মধ্যে মাতৃহারা সন্তানের ব্যথা বেশি করে বেজেছিল।) একজন হত্যাকারীও পুলিশের গুলিতে মারা যাননি। বরং প্রশাসনের নির্দেশে পুলিশ নিস্পৃহ হয়ে দেখে গেছে হত্যালীলা। তবু কংগ্রেসের প্রসাদভোগী বুদ্ধিজীবীদের মতে এটা গণহত্যা নয়। গণহত্যা হল গুজরাটের সংঘর্ষ। চমৎকার বিচার। আর শাস্তিদানের প্রসঙ্গ? আজ অবধি দিল্লি গণহত্যায় কোনও বড় মাথা শাস্তি

পায়নি। যা পাওয়ার পেয়েছে চুনোপুঁটিরা। সিবিআইয়ের বদান্যতায় ৩০ বছর পরেও সজ্জন কুমার-টাইটলারদের ধরতে চোর-পুলিশ খেলা চলছে। এপর্যন্ত দিল্লি কাণ্ডে ৭টি মামলায় মাত্র ১৬ জন অভিযুক্ত অল্প মেয়াদের সাজা পেয়েছে। আর গুজরাটের দাঙ্গায় ২০১৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ২৪৯ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ড দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে মুসলিম আছে ৬৫ জন। হিন্দুর সংখ্যা ১৮৪। যার মধ্যে মোদীজীর মন্ত্রী ডাঃ মায়া কোদনানী ও বাবু বজরঙ্গীর মত নেতাও আছেন, যাঁদের ২৮ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবুও বলা হচ্ছে, মোদীর রাজ্যে বিচার নেই, বিচার আছে দিল্লিতে। বিচার আছে দেগঙ্গা কাণ্ডের ধাত্রীভূমি এই বাংলাতে, যেখানে দাঙ্গার শিকার হয়েছে হিন্দুরা, তাই খবর ছাপা চলবে না। সেকুলার দিদিমণির নির্দেশে। সেকুলার মিডিয়ার সিদ্ধান্তে।

এরা কার দালাল?

কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র শাকিল আহমেদ মশাই সম্প্রতি বলেছেন আই.এম (ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন) দলটির জন্ম হয়েছে গুজরাটের দাঙ্গার জন্য। নরেন্দ্র মোদী এর জন্য দায়ী। একই মত রাহুল ঘনিষ্ঠ কংগ্রেসের আর এক বিরাট মাপের দিগ্‌গজ নেতা দিগ্বিজয় সিং এবং আরও অনেকের। চারদিক থেকে যখন প্রতিবাদ উঠল এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে এবং কংগ্রেসের অনেকে দেখল একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে শাকিল, তখন এক লাইনের একটি ছোট্ট ঘোষণা হল — শাকিলের বক্তব্যের সঙ্গে কংগ্রেস দল বা ভারত সরকার সহমত পোষণ করে না। তারা মনে করে আই.এমের জন্ম পাকিস্তানের মদতে, তাদের কাজকর্মও ঘটে পাকিস্তানের মদতে।

কিন্তু প্রশ্নটা হল, যে আই.এম ভারত জুড়ে গত কয়েক বছর ধরে সন্ত্রাস চালাচ্ছে, হত্যা করেছে শতাধিক মানুষ, তৈরি করেছে এক ভয়ের বাতাবরণ —তাদের উদ্ভবের জন্য মোদীকে দায়ী করে কাদের স্বার্থ রক্ষা করতে চাইছে কংগ্রেস? দিল্লীর বাটলা হাউসের সংঘর্ষে যুক্ত সন্ত্রাসবাদীদের 'সোনার ছেলে' বলে সার্টিফিকেট দিয়ে কাদের দালালি করছেন দিগ্বিজয়? মৃত সন্ত্রাসীদের ছবি দেখে কেঁদে ভাসিয়েছিলেন শ্রীমতী সোনিয়া, আজমগড়ে তাদের বাড়ি গিয়ে সমবেদনা জানিয়ে এসেছিলেন রাজপুত্র রাহুল। অথচ কারও সময় হয়নি ওই সংঘর্ষে নিহত পুলিশের হাবিলদার মোহনচাঁদ শর্মার বাড়িতে গিয়ে একটু শোকজ্ঞাপন করার। বরং রাজা দিগ্বিজয় দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম গোয়েন্দা কুকুরও হার মানে এমন দক্ষতায় গন্ধ না শুঁকেই অর্থাৎ ঘটনাস্থলে না গিয়েই এবং কোনও তদন্ত না করেই বলেছিলেন, পুলিশ মরেছে পুলিশের গুলিতে। তাঁর দল কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টি-বহুজন পার্টি ও কম্যুনিস্টদের দাবিতে ঘটনার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া

হয়েছিল। কয়েকদিন আগে সিবিআই আদালত সেই মামলার রায় দিয়েছে। বলেছে — 'সোনার ছেলে নয়, ওরা সবাই হার্ড কোর টেররিস্ট'। তবু দিগ্বিজয় গোঁ ছাড়েন নি। বলেছেন মন্তব্য প্রত্যাহার করবেন না।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, দেশের সিকিউরিটি নিয়ে, সন্ত্রাসবাদের মত স্পর্শকাতর বিষয়ে এরকম পাতলা কথা বলা এবং বলার দায়ে বক্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে বরং তাদের প্রমোশন দিয়ে কোন বার্তা দিতে চাইছে কংগ্রেস ও তার সেকুলার সাঙ্গপাঙ্গরা? বার্তাটা কি এই নয় যে, মুসলিম ভোটের জন্য আমরা সবকিছু করতে পারি? বার্তাটা কি এই নয় যে, ভারত যায় যাক, সিংহাসনটা থাক! আপনারাই বলুন, এরা কার দালাল?

শেষের খবর এবং শুরুর খবর

নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে দাঙ্গায় পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকার শেষ অভিযোগও খারিজ হয়ে গেছে আদালতে। আমেরিকা-ব্রিটেনসহ বহির্বিশ্বের দেশগুলিও বুঝতে পেরেছে মোদীবিরোধী তথা হিন্দুত্ববিরোধী তথাকথিত সেকুলারদের গেমপ্ল্যানের পিছনের আসল রহস্য। তথাপি মিথ্যাচারীদের 'হেট মোদী' ক্যাম্পেন অব্যাহত। কিন্তু আজকের ভারতবাসী, বিশেষ করে আজকের যুবসম্প্রদায় আক্ষরিক অর্থে 'মোদী সেনা' হয়ে উঠেছে। তারা বুঝতে পেরেছে — ভীমরুলের চাকে ঘা মেরেছেন মোদী, তাই তাঁকে কামড়াতে এগিয়ে এসেছে স্বার্থান্বেষী, কুটিল, ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা চরম সাম্প্রদায়িক শক্তিরা। নিজেদের শক্তিতে কুলোবে না বলে এরা এগিয়ে দিচ্ছে বিখ্যাত মানুষদেরও। আর এই বিখ্যাতদের এক-আধজন আহাম্মকের মত নিজের অধিকারের সীমা টপকে গিয়ে উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করেছেন — 'আমি নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই না' (অমর্ত্য সেন)। যদিও, সব ব্যাপারে ওস্তাদি করার ঝোঁকওয়ালা এই মানুষটির অনাহূত ভাষণে কান দেবার লোক বড় কম। আজকের যুবশ্রেণি জানে — সরকারি ডোল (Government Spending) বাড়িয়ে দিয়ে গরীবকে গরীব হিসেবে বাঁচিয়ে রাখার অমর্ত্যনীতির চেয়ে শিল্প আর সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের উন্নতির মোদী-মন্ত্র অনেক বেশী সমর্থনযোগ্য। এই মন্ত্রই ভারতের জীয়নকাঠি। মোদীর হাতে সেই ভারতের যাত্রা শুরুর অপেক্ষায় আছে ভারতের যুবশ্রেণি, ভারতের মানুষ। আর এজন্যেই নতুন দিনের বজ্রনির্ঘোষ: ''মিথ্যাচারীরা দূর হটো। ধান্ধাবাজরা নিপাত যাও। নরেন্দ্র মোদি স্বাগতম। ভারতীয় জনতা পার্টি-র সরকার স্বাগতম।"

।। স্মরণ: ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ।।

প্রায় নিঃশব্দেই চলে গেল আরও একটি ৬ জুলাই এবং ২৩ জুন। প্রথমটি ভারতকেশরী ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন (৬ জুলাই, ১৯০১) এবং দ্বিতীয়টি তাঁর বলিদান দিবস (২৩ জুন, ১৯৫৩)। কলকাতার প্রথম শ্রেণির কোনও দৈনিকপত্র প্রয়োজনই বোধ করেনি দিন দুটিকে স্মরণ করার। একইভাবে বিজেপি ছাড়া কোনও রাজনৈতিক দলেরও মনে পড়েনি দিন দুটির কথা। অথচ, দলমত নির্বিশেষে পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের অন্তত উচিত ছিল আন্তরিক স্মরণের মাধ্যমে শ্যামাপ্রসাদকে শ্রদ্ধার্ঘ ও কৃতজ্ঞতা জানানো। মাত্র ২৬ বছর বয়সে লণ্ডন থেকে ব্যারিস্টার হওয়া, মাত্র ৩৩ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকালের কনিষ্ঠ উপাচার্য হওয়া ছাড়া আরও বহুবিধ কর্মকাণ্ডের কাণ্ডারী এই মানুষটির জন্যই আজ আমরা ভারতে বাস করতে পারছি। মুসলিম লীগ-কংগ্রেসের যৌথ চক্রান্তে ও কম্যুনিস্টদের মদতে দেশভাগ যখন অবশ্যম্ভাবী তখন একটা চেষ্টা প্রবলভাবে শুরু হয়েছিল সমগ্র বাংলাকে ভারতের বাইরে রেখে আলাদা একটা দেশ করার জন্য। এব্যাপারে কংগ্রেস দায়িত্ব দিয়েছিল শরৎচন্দ্র বসুকে, আর মুসলিম লীগ নামিয়েছিল সুরাবর্দি সাহেবকে। লীগের পরিকল্পনা ছিল পুরো বাংলাকে ভারতের বাইরে রাখাটা হবে প্রথম ধাপ। পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ইচ্ছানুসারে পুরো দেশটার ইসলামিকরণ করা যাবে বা পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যাবে। মনে রাখা উচিত, তারও আগে মহম্মদ ইকবাল, যাকে পাকিস্তানের আধ্যাত্মিক এবং আদর্শগত গুরু হিসেবে মান্য করা হয়, তিনি ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে মুসলিম লীগের সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে প্রথম দাবী করেন পাকিস্তানের। ১৯৩৭ সাল থেকে জিন্নাহ্-ও প্রবলভাবে এই দাবীর সমর্থনে প্রচার করতে থাকেন। জিন্নাহ্ চেয়েছিলেন সমগ্র পাঞ্জাব, সমগ্র বাংলা (আসাম-সহ), কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় ও মুসলিম শাসকদের অধীনে থাকা ভারতের বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত হবে পাকিস্তান। ("Jinnah wanted a Pakistan that extended into Hindu majority areas of India by demanding the whole of Punjab, whole of Bengal (including Calcutta and Assam) and also the areas which were under Muslim rulers" - *Heretic, Communist, Muslim*
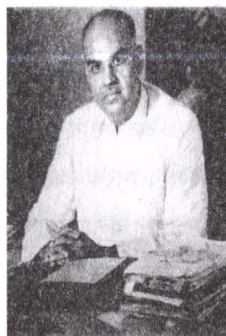
Leaguer by Yasser Latif Hamdani) নেহরুর আপত্তি ছিল না। কারণ, জাতি হিসেবে স্বাধীনতার লড়াইয়ে যাদের সর্বাধিক আত্মত্যাগ, সেই বাঙালিরা কখনোই ক্ষমতালিপ্সু ও ধান্ধাবাজ নেহরুর প্রিয় ছিল না। সারা দেশে তাঁর (এবং গান্ধীজীরও) একমাত্র প্রতিস্পর্ধী ছিলেন এক বাঙালি — নেতাজী সুভাষ। কিন্তু তাইহোকু বিমানবন্দরের দুর্ঘটনার মিথ্যে গল্প ফেঁদে (জাস্টিস মনোজ মুখার্জি কমিশন তা প্রমাণ করে দিয়েছে) এবং জীবিত নেতাজীকে সুকৌশলে সোভিয়েত সাইবেরিয়ার বন্দী জীবনে নির্বাসিত করে নেহরুর গদি তখন নিষ্কণ্টক। অতএব বাঙালি থাকল কি গেল তাতে তাঁর কোনও মাথাব্যথা ছিল না (মনে রাখবেন, স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দুরা যে বিপুল সাহায্য পেয়েছিল সরকার থেকে, তার এক শতাংশও পায়নি পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দু বাঙালি)। এই টালমাটাল সময়ে নেহরুর সামনে প্রতিস্পর্ধী হয়ে দাঁড়ালেন শ্যামাপ্রসাদ। রুখে দাঁড়ালেন শরৎ বসু-সোরাবর্দির চক্রান্তের বিরুদ্ধে। তিনি মুসলিম-বিদ্বেষী ছিলেন না, কিন্তু মুসলিমদের ধর্মান্ধ রাজনীতির আসল চেহারাটা দেখেছিলেন। মাত্র কিছুদিন আগে ঘটে গেছে কলকাতার বুকে বীভৎস হিন্দু নিধনের ঘটনা, হিন্দু রমণীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের ঘটনা। হিন্দু বাঙালিকে বাঁচাতে শ্যামাপ্রসাদ তাই দাবি তুললেন বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে ভারতে রেখে তৈরি করতে হবে পশ্চিমবাংলা রাজ্য। আর তার ফলেই কলকাতাসহ গঙ্গাপারের বিস্তীর্ণ এলাকা ভারতে অন্তর্ভুক্ত হল। এটাই হল ইতিহাস। এই ইতিহাসের সঙ্গে হিন্দু বিদ্বেষী ও মুসলিম তোষণকারী কম্যুনিস্ট বীরপুঙ্গবরা — মুসলিম ভাইদের হাতে কচুকাটা হওয়ার ভয়ে সময় থাকতে এদেশে পালিয়ে এসেছিলেন এবং পালিয়ে এসে সম্প্রীতির কোরাস গাইতে শুরু করেছিলেন — তাদের তৈরি ঝুটা ইস্তাহারের অনেক ফারাক। তারা এখনও গেয়ে যায় — শ্যামাপ্রসাদের জন্যই নাকি বাংলা ভাগ হয়েছিল। মিথ্যাচার এবং শয়তানিরও একটা সীমা থাকা উচিত। তাই না?

দেশভাগের পর শ্যামাপ্রসাদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হলেন। পেলেন শিল্প ও সরবরাহ দফতর। যেসব ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠান আজও দেশের গর্ব, তাদের অনেকগুলির পরিকল্পনা ও সূচনা, তাঁরই হাতে। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদের ওপর নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকা হত্যালীলা ও অত্যাচার বন্ধ করতে নেহরু যখন যথার্থ অর্থে কোনও ব্যবস্থা নিলেন না, বরং নেহরু-লিয়াকৎ আলি চুক্তির (১৯৫০) মাধ্যমে মাইনরিটি কমিশন গঠন করে এদেশের মুসলিমদের তোষণের বন্দোবস্ত করে ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি শুরু করলেন, তখন প্রতিবাদ জানিয়ে মন্ত্রীসভা ত্যাগ করলেন শ্যামাপ্রসাদ। পদত্যাগের সময় বলেছিলেন —পাকিস্তানের মাইনরিটি কমিশন ওদেশের

হিন্দুদের রক্ষা করবে না। এই চুক্তি ভারত সরকারের দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা। পক্ষান্তরে এর দ্বারা এদেশের মাইনরিটিদের তথা মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার কাজ পাকাপাকিভাবে করে নিলেন লিয়াকৎ আলি। শ্যামাপ্রসাদ যে কতটা সত্যদ্রষ্টা তা দু'দেশের মাইনরিটি কমিশনের দিকে তাকালে আজ আমরা বুঝতে পারি।

নেহরুর এই তোষণের রাজনীতি, অপরিণামদর্শী রাজনীতি ও স্বেচ্ছাচারী রাজনীতির আর এক উদাহরণ কাশ্মীর। রাজা হরি সিংয়ের কাতর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে অযথা কালক্ষয়ের ফলে কাশ্মীরের এক বিস্তীর্ণ অংশ দখলে নিল পাকিস্তান। ভারতীয় সেনাবাহিনী চেয়েছিল সেই মুহূর্তে যুদ্ধ করে পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নিতে। বাদ সাধলেন নেহরু। তৈরি হয়ে গেল অনন্তকালের জন্য এক বিষফোঁড়া, যার নাম আজাদ কাশ্মীর। এই আজাদ কাশ্মীরের টানে ও প্ররোচনায় এদেশের কাশ্মীরে আজও অব্যাহত সন্ত্রাস। আর একটিই মানুষ এর জন্য দায়ী — তিনি নেহরু। খণ্ডিত কাশ্মীরের তখতে বসলেন শেখ আবদুল্লা। অদ্ভুত কিছু নিয়মকানুন তৈরি হল কাশ্মীরের জন্য। তাদের থাকবে আলাদা প্রধানমন্ত্রী, আলাদা পতাকা, আলাদা আইন। ওখানে যেতে গেলে ভারতীয়দের জন্যও পাসপোর্ট-ভিসা লাগবে। অথচ ওটা নাকি ভারতেরই একটা রাজ্য। শ্যামাপ্রসাদ গর্জে উঠলেন। কাশ্মীরের পূর্ণাঙ্গ ভারতভুক্তির দাবিতে পাশপোর্টভিসা ছাড়াই যাত্রা করলেন কাশ্মীরে। আর তখনই বেরিয়ে পড়ল কোটের পকেটে লাল গোলাপ গুঁজে রাখা কোমলহৃদয় পণ্ডিত নেহরুর মুখোশের আড়ালে ঢেকে রাখা আসল মুখ। শেখ আবদুল্লার সঙ্গে মিলিতভাবে এক ষড়যন্ত্র তৈরি হল। অ্যালিবাই ঠিক রাখতে বিশ্রামে গেলেন নেহরু, লণ্ডনে। আর কাশ্মীরে পা রাখা মাত্রই শেখ সাহেব বন্দি করলেন শ্যামাপ্রসাদকে। পাঠালেন কারান্তরালে। সেখানে বিনা চিকিৎসায়, কুচিকিৎসায় এবং নানান অত্যাচারে মেরে ফেলা হল তাঁকে। তারপর মৃতদেহের সুরতহাল না করে — দিল্লিতে না পাঠিয়ে দেহ পাঠানো হল কলকাতায়। শ্যামাপ্রসাদের মায়ের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও কোনও তদন্তের ব্যবস্থা হল না এই অকস্মাৎ মৃত্যুর কারণ জানার জন্য। তার প্রয়োজনই বোধ করেননি নেহরু। কেননা, আগে থেকে তৈরি চিত্রনাট্যে তাঁর সংলাপটি তিনি লণ্ডনে বসে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে দিয়েছেন — 'এই মৃত্যুর জন্য শেখ আবদুল্লাকে দায়ী করা যায় না।'

যে মানুষটি বাংলার জন্য, বাঙালির জন্য, ভারতের জন্য, ভারতীয়তার জন্য তাঁর জীবন বলিদান দিয়েছেন — তাঁকে তাঁর প্রাপ্য শ্রদ্ধা জানাতে কেন আমরা ভুলে যাই? ইতিহাস কিন্তু বড় নির্মম। সে কখনও ক্ষমা করবে না।

প্রতিবেদন দুটি পড়ুন ও পড়ান।

প্রয়োজনে সাধ্যমত জেরক্স করে পরিচিতদের মধ্যে ছড়িয়ে দিন

— আপনার স্বার্থে, দেশের স্বার্থে।

মনে রাখবেন, ধান্দাবাজ রাজনৈতিক দলগুলি ভোটের স্বার্থে যে মিথ্যা প্রচার ও নির্লজ্জ তুষ্টিকরণের রাজনীতি শুরু করেছে, তার হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে, দেশকে পুনরায় বিভাজনের হাত থেকে বাঁচাতে আপনারও কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্য পালন করুন।

ভারতীয় জনতা পার্টি বিধাননগর মণ্ডল স্টাডি সার্কেল-এর পক্ষে শ্রী নির্মল নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত এবং শ্রী রঞ্জিত ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত, প্রচারে শ্রী অশোক সরকার (৯৮৩১১৩৭০৩১), ডঃ দিলীপ কুমার চক্রবর্তী (৯৪৩৩৬৭০৪৮০) এবং উমাশংকর ঘোষদস্তিদার (৯৩৩১০৯০৯৬৭)

বিনিময় ১০ টাকা